ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ৯৭-১২২
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4306

পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজ (১৮৪৬-১৯০০) : সংস্কার ও পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন

মোঃ হাসাইবুর রহমান[*], শান্তা পত্রনবীশ[**]
[*]প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[**]সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Reform movements in Bengal in the mid-nineteenth century increasingly emphasized the transformation of women's status, with women's education emerging as a central issue. While Calcutta became the hub of women's education, eastern Bengal lagged behind due to conservative attitudes of the patriarchy towards women's education, purdah, child marriage, and deeply rooted religious-cultural obstacles. Against this backdrop, the spread of women's education in eastern Bengal during the latter half of the nineteenth century marked a significant social and cultural shift, with the Brahmo Samaj playing a pioneering role. This study examines the initiatives of the Brahmo Samaj of eastern Bengal in promoting women's education in this region between 1846 and 1900, exploring the socio-cultural contexts that shaped these efforts and their impact on society. Methodologically, this qualitative research employs historical and analytical approaches, drawing on primary sources such as contemporary newspapers, autobiographies of Brahmo leaders, and publications of the Brahmo Samaj, as well as secondary works. The findings suggest that the Brahmo Samaj identified women's education as a precondition for social progress and worked toward it through the establishment of schools, curricular reforms, associations, and public advocacy. These initiatives gradually influenced middle-class attitudes though the process was marked by tensions between concepts of colonial modernity and local religious-cultural resistance. While the impact of the Brahmo Samaj was largely confined to urban areas, educated middle classes, and followers of a particular faith, the movement nonetheless laid the groundwork for women's informal and institutional education in eastern Bengal. In the long run, these efforts became an important precursor and guiding force to wider socio-cultural transformation of this region.

Key Words: East Bengal Brahmo Samaj, Women's Education, Social Reform, Religious Conservatism, Modernization of Women.

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালপর্বে বাংলা প্রদেশে শিক্ষাকার্যক্রম বিকাশে খ্রিষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগ, বেসরকারি উদ্যোগ এবং সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত উদ্যোগকে আলাদা

আলাদাভাবে উপস্থাপন করা যায়। আবার অন্তঃপ্রাদেশিক বা আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতেও এরূপ আলোচনা উত্থাপন করার সুযোগ রয়েছে। যেমন বাংলা প্রদেশের দুই অংশে; পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের মাত্রা বিবেচনা করে তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করলে পূর্ব বাংলার অবস্থান যে দ্বিতীয় হবে সে বিষয়টি স্পষ্ট। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দূরবর্তী অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত দিক থেকে অনগ্রসর পূর্ব বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে খ্রিষ্টান মিশনারিরা পশ্চিম বাংলার ন্যায় সমপর্যায়ে উৎসাহী ছিলেন না। কলকাতাবাসী পূর্ববঙ্গের জমিদারদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে নিজ জমিদারির তুলনায় রাজধানী কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাবিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন বিভিন্ন কারণে। এমন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষার উন্নয়নও সেই মাত্রার দ্রুত গতিতে হয়নি, যেমনটি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষার অনগ্রসরতার পশ্চাতে, সমাজে বিদ্যমান অবরোধ প্রথা, ধর্মীয় ও সামাজিক রক্ষণশীলতা, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের 'অনীহা', পিতৃতন্ত্র ইত্যাদি অনুষঙ্গকে দায়ী করা যায়। এরূপ বাস্তবতায় পূর্ব বাংলার ধর্মীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো বিবেচনায় নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যে কয়টি প্রতিষ্ঠান বা সংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সেগুলোর মধ্যে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের নাম সর্বাগ্রে আলোচনায় আসে। ব্রাহ্ম ধর্মমত সামাজিক যে সংস্কারগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে রেখে কার্যক্রম শুরু করেছিল তার মধ্যে নারীশিক্ষা বিস্তার ছিল অন্যতম। পশ্চিম বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখার পাশাপাশি পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের শাখাসমূহ নারীশিক্ষার উন্নয়নে রেখেছে উল্লেখযোগ্য অবদান। এ উদ্দেশ্যে নারীদের জন্য বিদ্যালয় নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ। তদুপরি জনসাধারণ বিশেষ করে নারীদের মধ্যে শিক্ষার্জনের আকাঙ্ক্ষা, সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল এই ব্রাহ্মসমাজ।

গবেষণা কৌশল

পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্মমত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দী সূচনার পূর্বে নারীশিক্ষার উন্নয়নে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলো তৎকালীন সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উপস্থাপন করা বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রাহ্ম ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে কীভাবে ভূমিকা রেখেছিল তাও এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদ কীভাবে নারীশিক্ষা তথা নারীর বহুমুখী সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারকারী ডিসকোর্সে পরিণত হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি তৎকালীন বাংলা প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নারীর অবস্থান, রাজনৈতিক 'ফায়দা' বিবেচনায় নারীশিক্ষার মান উন্নয়নে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক সরকারের সংশয়পূর্ণ অবস্থা এবং নারীর আধুনিকায়নের সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। চলমান নিবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি (Historical Research Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Method) অনুসরণ করে বর্ণনা এবং

বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজ-সংক্রান্ত পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্মগুলোর বেশিরভাগ সম্পাদিত হয়েছে এই ধর্মমতের উৎপত্তিস্থল কলকাতাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় নারীর আধুনিকায়নের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে নারীশিক্ষাকে মূল উপজীব্য করা হয়েছে পূর্ববঙ্গকে কেন্দ্রস্থলে রেখে। তবে কালিক পরিধি ১৮৪৬ সালে পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত হওয়ায় প্রসঙ্গক্রমে অখণ্ড বাংলার রাজধানী কলকাতার বর্ণনা প্রবন্ধে কয়েকবার যুক্ত হয়েছে। চলমান গবেষণার স্থানিক পরিধি পূর্ববঙ্গ উল্লেখ করা হলেও ব্রাহ্মসমাজের নারীশিক্ষা বিস্তার যেকটি জেলায় দৃশ্যমান হয়েছিল (ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও চট্টগ্রাম) আলোচনা এইসব জেলাকেন্দ্রিক।

তাত্ত্বিক কাঠমো

উনিশ শতকে বাংলায় যে সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার আসে, সেখানে নারীর অবস্থা পরিবর্তনের বিষয়টি অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে নারীর সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, উনিশ শতকের শেষ ভাগে এসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থানের ফলে তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের তীব্রতা যতো বাড়ে ততই নারীবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা গৌণ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় নারী সমস্যার বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে জাতীয়তাবাদী শক্তির অসম্মতিকেই মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন ঐতিহাসিক পার্থ চ্যাটার্জী। তিনি তার বহুল আলোচিত প্রবন্ধ 'The Nationalist Resolution of the Women's Question'- এ বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।[১] তার মতে, প্রাথমিক অবস্থায় ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুটো Sphere বা স্তরে গড়ে উঠেছিল। তিনি এদেরকে Material ও Spiritual (বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক) বা Outer ও Inner (বাহির ও ঘর) স্তর হিসেবে অভিহিত করেন। বস্তুগত বা বাইরের যে স্তর সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন: শিক্ষা, অর্থনীতি, প্রশাসন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্পষ্টতই পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করছিল। অর্থাৎ বস্তুগত বিচারে পাশ্চাত্য জয়ী হয়েছিল। তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ববোধের জায়গায় আর কোনো ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকা শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পুরুষকুল উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাদের এই সংগ্রামকে একটা পর্যায়ে সনাতন, ভারতীয় বনাম আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার আদর্শের লড়াই হিসেবে দেখেছিলেন। আর স্বাভাবিকভাবেই এই অভিঘাতটা এসে পড়ে অন্তঃপুরের নারীদের ওপরে। তখন জাতীয়তাবাদী শক্তি নারীর সংস্কারের প্রশ্নে ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে কোনোরকম দরকষাকষিতে না যাবার অবস্থানে অনড় থাকে। ফলে এই পর্যায়ে সনাতন জীবনাদর্শ এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যুগোপযোগী আধুনিকতার সমন্বয়ে এক নতুন ধরনের নারীত্বের নির্মাণ হয়। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের 'angel in the home'- এর সাথে সংগতি রেখে নারীর নতুন ভাবমূর্তি দাঁড়ালো 'কল্যাণী' বা 'গৃহলক্ষ্মী' রূপে। ইতিহাসবিদ সোনিয়া নিশাত আমিন 'কল্যাণী' ও 'গৃহলক্ষ্মী' ধারণার সারসংক্ষেপ করেছেন এইভাবে,

"অবদানকারী, নীড়নির্মাতা, মাতা, অভিভাবক, গৃহদেবীর সংরক্ষক, জীবনের নিত্য সঙ্গী। এককথায় একজন দেবী– যিনি গৃহিণীরূপে আবির্ভূত।"[২] তবে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা 'কল্যাণী' বা 'গৃহলক্ষ্মী'র বিমূর্ত ধারণাটি গ্রহণ না করে প্রতীকী রূপটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষে হিন্দুদের জন্য উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিমদের জন্য স্বরূপসন্ধানী আধুনিকতা– এই ছিল প্রাধান্য বিস্তারকারী discourse বা কথন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তখন নারী প্রশ্নটি আলোচিত হয়। এই আদর্শগত কাঠামোয় নারীর সংস্কারের প্রশ্নে সবচেয়ে অগ্রণী ছিল ব্রাহ্মসমাজ। তারা তাদের সংস্কার আয়োজনের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে নারীর অবস্থার উন্নতির কথা বিবেচনা করেন। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মরা ভিক্টোরিয়ান/এডোয়ার্ডিয়ান সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন– যার ভিত্তি ছিল উদারনৈতিকতাবাদী এবং উপযোগিতাবাদীদের দার্শনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ।[৩] ব্রাহ্মরাই প্রথম নারীমুক্তির বাস্তবানুগ পরিকল্পনা গ্রহণ করে একটি যৌক্তিক মডেল স্থাপন করেছিলেন। তারা 'ভদ্রমহিলা'র যে stereotype ধারা গড়ে তুলেছিলেন তা ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের লক্ষ্যের সাথে মানানসই। এ সকল কারণেই ব্রাহ্মদের সমাজসংস্কারের কেন্দ্রে ছিল নারী। কেশবচন্দ্র সেন এজন্য ঘোষণা করেছিলেন, "No country on earth ever made sufficient progress in civilization when women were sunk in ignorance. In fact the actual position of the women is an index to the social status of the nation to which they belong."[৪] নারীর আধুনিকায়নে নারীশিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ, সকল ক্ষেত্রে ব্রাহ্মরা নিজেরাই পথপ্রদর্শকের কাজ করেছেন। পূর্ববঙ্গে এসকল নারী উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ পথিকৃৎ ও পতাকাবাহীর ভূমিকা পালন করেছে।

উনিশ শতকের পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা

উনিশ শতক জুড়ে হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে সমাজ সংস্কারের নিমিত্তে যে আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলোর মূল বিষয়বস্তু ছিল সমাজে পিছিয়ে থাকা নারীসমাজের মুক্তি। এই লক্ষ্যে সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা বাতিল করার জন্য আন্দোলনগুলো নারীমুক্তির ভাবনাকে এগিয়ে নিতে থাকলেও নারীর সত্যিকার অর্থে মুক্তির জন্য সবথেকে যুগোপযোগী পদক্ষেপ ছিল নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো। বাংলা প্রদেশের নারীসমাজ উনিশ শতকের শুরুর দিকে এসেও প্রায় সম্পূর্ণ অক্ষর জ্ঞানহীন ছিল।[৫] নারীকুলকে এরূপে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় মন্তব্য করেন যে,

> স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কীরূপে নিশ্চয় করেন?[৬]

পূর্ব বাংলা তথা বাংলার নারীদের এই সামগ্রিক পশ্চাৎপদতা বা শিক্ষাবঞ্চিত অবস্থার পেছনে বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা, শিক্ষিত নারী বিধবা হয় এমন প্রচলিত কুসংস্কার, পরিবারের কর্তাদের নারীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ না জন্মানো, নারীশিক্ষা বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের অনাগ্রহ, নারী শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য। মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার্জনে সবথেকে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে পরিলক্ষিত হয় বাল্যবিবাহ। এছাড়া অবরোধ প্রথার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারীদেরকে গৃহাবদ্ধ করে রাখা হতো যা নারীশিক্ষায় প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।[৭] এই অবরোধ প্রথার প্রচলন থাকার কারণে বাংলার নারীরা অন্দরমহলের বাহিরের জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতো চুড়ি, ফিতা, বোতাম বিক্রি করতে আসা ফেরিওয়ালা, নরসুন্দর কিংবা মালিশওয়ালাদের মাধ্যমে। নারীদের মধ্যে আন্তঃপারিবারিক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবেও তারাই কাজ করেছে।[৮] বাংলার পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর কর্তাস্থানীয়রা প্রাপ্তিযোগহীন বিনিয়োগ চিন্তা করে নারীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না বলা যায়। এমনকি উনিশ শতকের শেষ নাগাদ এসেও পূর্ব বাংলার নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য সে বিষয়টি ভাবতই না।[৯] শিক্ষিত মেয়েদের স্বামী মরে যায় বলে প্রচলিত থাকা কুসংস্কারটিও বিভিন্নভাবে নারীকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বাঙালি নারীকে 'পতিব্রতা' করে তুলেছিল। এছাড়া শিক্ষিত নারীদের পাত্রস্থ করার সংকটও পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষা বিস্তারে অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। পূর্ববঙ্গের অবকাঠামোগত দুর্বলতা বিশেষ করে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পুঁজির অভাবও ছিল নারীর শিক্ষাবিস্তারে বাধাস্বরূপ।

ঔপনিবেশিক সরকার স্থানীয় ধর্মীয় মতবাদ ও সামাজিক কাঠামোতে হস্তক্ষেপ করে লোকজনের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাব্য 'ক্ষতি' বা প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে তেমনভাবে নারীশিক্ষার কাজে অগ্রসর হয়নি। এমনকি ১৮৫৪ সালে ভারতীয় শিক্ষার ম্যাগনাকার্টা বা মহাসনদ নামে পরিচিত উডের ডেসপাস (Wood's Despatch)-এ নারীশিক্ষার উন্নয়নে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ্য থাকার পরেও সরকারিভাবে তেমন উদ্যোগ বাংলা প্রদেশের দুই অংশে, বিশেষত পূর্ব বাংলায় পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়া ভারতবর্ষের মুসলিমরা দীর্ঘদিন ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে এসেছিল যা পরোক্ষভাবে মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গের নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার মুসলিম নারীরা নিজেদের গৃহে আরবি ভাষা শিখত। স্বল্পসংখ্যক মুসলিম নারী উর্দু-ফারসির চর্চা করলেও অধিকাংশ পরিবার বাংলা ও ইংরেজি চর্চাকে শুধু নিষিদ্ধের কাতারেই নয় বরং এই চর্চাকে পাপকার্য হিসেবে দেখত। এই পর্যায়ে এসে মুসলিম বালিকারা যেমন খ্রিষ্টান মিশনারিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে প্রবেশের অনুমতি পেত না তেমনি মেয়েদের নিজেদের মধ্য থেকেও শিক্ষা অর্জনের তেমন অভিনিবেশ ছিল না। এছাড়া মিশনারিদের উদ্যোগে বালক-বালিকা উভয়ের জ্ঞানার্জনের জন্য ইংরেজি শিক্ষার যে বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলোতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক কম থাকায় অধিকাংশ বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১০] খ্রিষ্টান মিশনারি কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার সাথে শিক্ষার্থীদেরকে খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হতে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল অভিভাবকদের মধ্যে যা নারীশিক্ষার উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ ছিল।

পূর্ববঙ্গের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন। ধারণা করা হয় ১৮২৪ সালের পূর্বে এপার বাংলায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ষাটের দশকে এসে বেসরকারি উদ্যোগে পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, ফরিদপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে।[১১] উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকা শহরে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীলদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক অবনতির প্রেক্ষিতে যে ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার দরুন এই বালিকা শিক্ষালয়গুলো 'প্রাথমিক' পর্বের ওপরে উঠতে পারেনি। মেয়েদের বাল্যবিবাহের কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে বিবাহের পরে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য পারিবারিক অনুমতিপ্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা তেমন ছিল না। উপরন্তু অভিভাবকরা পুরুষ শিক্ষকের নিকট নিজের কন্যাকে পড়াতে চাইত না। অর্থাৎ, নারী শিক্ষকের অভাব এ অঞ্চলের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অন্যতম বাধাস্বরূপ ছিল।[১২]

নানামুখী প্রতিবন্ধকতার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে কিংবা বলতে গেলে নারীর অচলায়তন ভাঙতে শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনকে অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে যৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্বক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারীশিক্ষার উন্নয়নে এগিয়ে এসেছিল নবজাগরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মদের শিক্ষাচিন্তার প্রধান কথা হলো বালক-বালিকাদের নৈতিক এবং আত্মিক উন্নয়নে সহযোগিতা করা। প্রচলিত পাঠক্রমের সাথে নীতি, ধর্ম অথবা আত্মিক চর্চাকে সংযুক্ত রেখে বাস্তবমুখী শিক্ষাকার্যক্রম চালুর মাধ্যমে একজন 'সম্পূর্ণ মানুষ' তৈরির চেষ্টা করেছে ব্রাহ্মসমাজ। শুধু নেতৃস্থানীয়দের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনগুলিই নয় বরং বঙ্গদেশে ব্রাহ্মরা একত্রিতভাবে অনেক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্রাহ্মদের বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি প্রচলিত বক্তব্য ছিল যে, "যেখানেই কোন ব্রাহ্ম গিয়েছেন, সেখানে তিনি এক পকেটে একটি 'সমাজ' অন্য পকেটে একটি বিদ্যালয় নিয়ে গেছেন।"[১৩] প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশীয়দের দ্বারা পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল ১৮৬১ সাল থেকে ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় প্রগতিশীল ব্যক্তির হাত ধরে।

পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ

বাংলায় নবজাগরণের অগ্রপথিক রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজ। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ধর্মমত প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার দূর করা, সনাতন বা প্রচলিত হিন্দু ধর্মে বর্ণবৈষম্য দূরীকরণপূর্বক সার্বিক সংস্কার সাধন এবং নরনারীর সমান অধিকার ও সামাজিক সংস্কারগুলোর মাধ্যমে আলোকিত, আধুনিক সামাজিক কাঠামো তৈরি করা। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যবিন্দুতে ছিল নারীর আধুনিকায়ন। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও পরবর্তী সময়ে দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৪৬ সালের ৬ ডিসেম্বর (১২৫৩ বঙ্গাব্দের ২২ অগ্রহায়ণ, রবিবার) ঢাকার শাঁখারি বাজারে ব্রজসুন্দর মিত্রের বাড়িতে ব্রাহ্ম উপাসনালয় স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের যাত্রা শুরু হয়। কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রায় আঠারো বছর পরে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের আত্মপ্রকাশ লগ্নে ব্রজসুন্দর মিত্রসহ উপস্থিত ছিলেন যাদবচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু, গোবিন্দচন্দ্র বসু, বিশ্বম্ভর দাস, নরোত্তম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[১৪] ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ বর্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারে জন্ম লাভ করা ব্রজসুন্দর মিত্র ১৮৩৫ সালে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কলকাতা গমন করার পরে সেখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্ম ধর্মমতে দীক্ষার্জন করেন। পরের বছর ঢাকায় ফেরত এসে প্রায় এক দশক ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ববঙ্গে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজের যাত্রা শুরু করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৫] ১৮৪৬ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর, পাবনা, যশোর, খুলনা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৯৯টি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার তথ্য পাওয়া যায়।[১৬] বাংলা প্রদেশে কলকাতার পর ঢাকা ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম সক্রিয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। উপরন্তু কলকাতা ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি ও কার্যক্রমের অগ্রগতি তৈরি হয়েছিল সেখানে পূর্ববঙ্গের মানুষজনের সরব উপস্থিতির কারণে।[১৭] মূলত ১৮৬০-এর দশকে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ তারুণ্যের সংস্পর্শে এসে হিন্দু ধর্মমতে দীর্ঘদিনের প্রচলিত গোঁড়ামিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে। ১৮৬৬ সালে অন্যতম ব্রাহ্ম পথপ্রদর্শক কেশবচন্দ্র সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় এসে এই তরুণদেরকে উৎসাহ প্রদান করেন। পূর্ববঙ্গে সমকালে প্রগতিশীলতার প্রতীক ছিল ব্রাহ্মসমাজ এবং সেই সময়টি ঢাকার ব্রাহ্ম আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ ছিল।[১৮] এই সময় থেকে পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষার উন্নয়নে জড়িত হয় ব্রাহ্মসমাজের নাম।

ঢাকায় নারীশিক্ষা বিকাশে ব্রাহ্মসমাজের অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ফলে উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে যে পরিবর্তনগুলো সূচিত হয়েছিল সেগুলো ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিচরণ ও হিন্দুধর্ম থেকে উদ্ভাবিত হওয়া ব্রাহ্ম ধর্মমতের বিকাশের ফলে সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। ঢাকার ব্রাহ্মকর্মীবৃন্দ পূর্ববঙ্গে নারীর এই 'নবমূল্যবোধ' নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিল। কেননা, ব্রাহ্মরাই পরিবারে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ব্যাপারে কথা তুলেছিল।[১৯] পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্র তার কন্যা মাতংগীকে শিক্ষা প্রদানের জন্য বাড়িতে শিক্ষক রেখেছিলেন। সেই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় যা ছিল উত্তেজনাসৃষ্টিকারী ঘটনা, যার সাধারণ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এলাকার স্থানীয় মানুষজন মাতংগীর তুলনামূলক পরিবর্তন দেখতে তার বাড়িতে ভিড় করত।[২০]

পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্মদের নারীশিক্ষা কার্যক্রম প্রথমত শুরু হয়েছিল ঢাকাকে কেন্দ্র করে। পূর্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকায় নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যেসকল ব্রাহ্মবিশ্বাসী

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্রজসুন্দর মিত্র, দীননাথ সেন, অনাথবন্ধু মৌলিক, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এখানকার ব্রাহ্মকর্মীরা স্থানীয়দের ব্রাহ্মমতের দিকে টানার থেকে মানবমুক্তির জন্য শিক্ষা, বিশেষত নারীশিক্ষার ওপর অধিকতর জোর প্রদান করেছিলেন।[২১] প্রাথমিকভাবে ব্রাহ্মদের গৃহীত এই উদ্যোগগুলো ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক।

ঢাকায় নারীশিক্ষা চালু ও বিকাশের ক্ষেত্রে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' অন্যতম একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। এই ব্যবস্থাটি 'জেনানা শিক্ষা' ব্যবস্থা নামেও পরিচিত ছিল। সর্বপ্রথম কলকাতায় চালু হওয়া অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল নারীরা ঘরে আবদ্ধ থাকলেও তাদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। এই ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সভা-সমিতিগুলো পাঠ্যতালিকা তৈরি, আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে পরীক্ষা নেওয়া, প্রেরিত উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে উত্তীর্ণদের পুরস্কার প্রদান করা, বাড়িতে গিয়ে নারী শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করত। অভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের শুরুতে এই ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা যায় পূর্ববঙ্গেও যার ফলশ্রুতিতে যাত্রা শুরু করে 'ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা'। যে ৫১ জন নারী-পুরুষ সদস্যের সম্মিলিত উদ্যোগে সভাটি স্থাপিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভার পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দীননাথ সেন, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখ। নারী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন শশীকলা সেনজায়া, ইচ্ছাময়ী দাসী, ফেনী শিক্ষয়িত্রী, হেমন্তশীল সেনজায়া, প্রসন্ন গুপ্তা ও স্বর্ণময়ী দেবী। ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভার মধ্যমণি ছিলেন সভার সম্পাদক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও নারীশিক্ষা বিস্তারে সভার অবদান বিবেচনা করে সরকার সভাকে বার্ষিক দেড়শত টাকা হারে সহযোগিতা প্রদান করা শুরু করেছিল।[২২] ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রতি শ্রেণিভেদে ভিন্নভিন্ন ছিল। সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, রচনা ও শ্রুতিলিপি, প্রয়োজনীয় বিষয় ইত্যাদি বিষয়ে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বার্ষিক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করে দেওয়া হতো। প্রশ্নমালা সভার পক্ষ থেকে পাঠানো হতো যেগুলোর উত্তর পরীক্ষার্থীরা ঘরে বসে লিখত। সভার নিয়মানুযী যারা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে তারা এই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারত না। ঢাকা জেলার নারীরা (এই জেলার অধিবাসী হয়ে অন্যত্রে অবস্থান করে থাকলেও) যারা সভার নির্ধারিত নিয়ম মেনে পরীক্ষায় অংশ নিতে আগ্রহী ছিল তাদের অভিভাবকদের নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও কোন শ্রেণিতে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তা উল্লেখ করে পাঠাতে হতো। প্রতিবছর পৌষমাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নাম পাঠানোর সময়সীমা থাকত বাংলা সনের আষাঢ় মাস পর্যন্ত। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রত্যেক শ্রেণিতে তিনটি (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়) করে পুরস্কার প্রদান করা হতো। পরীক্ষা পদ্ধতির শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বিশ্বস্ত কাউকে উত্তরপত্রের সাথে একটি অঙ্গীকারনামা লিখে পাঠাতে হতো। পরীক্ষায় নির্ধারিত নম্বরের বিপরীতে এক-তৃতীয়াংশ নম্বর না পেলে পরীক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে পারত না।[২৩] এই সভা ১২৭৭ বঙ্গাব্দের রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে

নিবন্ধন করা ৫৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৬ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৪। উত্তীর্ণদের মাঝে বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী ১২৫ টাকা মূল্যের পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়। ১২৮০ সনে [১৮৭৩ সাল] সভা সরকারের নিকট থেকে ১৫০ টাকা এবং অনুদান থেকে ১৬১ টাকা লাভ করে যার মধ্যে ১২১ টাকা বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হয়েছিল। ১২৮১ সনের আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সভা ৪ বছরে ৫ বার পরীক্ষা নেয় এবং এগুলোতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৬, ২৩, ১৮, ২৬ ও ৩৯ জন।[২৪] উল্লেখ্য, এই সভায় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অনেকে সহায়তা প্রদান করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমতের ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রায় ১২ বছর সভার মাধ্যমে ঢাকার নারীরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছিল। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রাণকুমার দাস।[২৫] ১৮৬৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মিকা সমাজের অনুকরণে ১৮৮২ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয় ব্রাহ্মিকা সম্মিলনীসভা। প্রসন্ন কুমার রায়ের স্ত্রী সরলা রায়-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সভা ব্রাহ্ম নারীদের জ্ঞান ও ধর্মোন্নতিতে দীর্ঘদিন বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল।[২৬]

১৮৭১-৭৫ সময়ে ঢাকায় নারীশিক্ষার উন্নয়ন ও নৈতিক অগ্রসরতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৬টি সভাসমিতির কার্যক্রম চলমান ছিল, এগুলোর মধ্যে ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত সভাগুলো ছিল প্রসিদ্ধ।[২৭] জ্ঞান অন্বেষণের আগ্রহ থেকে ব্রাহ্মকর্মী দীননাথ সেন ঢাকায় 'সার্কুলেটিং' লাইব্রেরি স্থাপন করেছিলেন ১৮৮০ এর দশকে যা ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি।[২৮] ১৮৭২ সালের ২১ জুলাই তারিখে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রী অভয়চন্দ্র দাসের নামসংযুক্ত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় যেখানে 'পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরী' খোলার কথা জানানো হয়। বিকেল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত এই লাইব্রেরি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হতো। লাইব্রেরিতে সাধারণের পাঠ্য এমন ইংরেজি ও বাংলা পুস্তক এবং পত্রিকা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল।[২৯] ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভার অনুকরণে ১৮৭১ সালে বিক্রমপুরের নারীদের অন্তঃপুরে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'কোরহাটী স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভা'। এই সভার সভ্যরাও ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভার ন্যায় প্রায় একইরকম নিয়মনীতি নির্ধারণ করে পরীক্ষা নেওয়ার কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। সভা ছাত্রীদেরকে পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের পুরস্কারস্বরূপ নারীশিক্ষার উপযোগী পুস্তক প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেছিল।[৩০]

ঢাকায় নারীশিক্ষার উন্নয়নে ব্রাহ্মসমাজের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

ঢাকায় নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগের সূচনা হয় মূলত উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে। যদিও সমাজসংস্কারের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে নারীশিক্ষাকে বিবেচনা করে ১৮৫৬ সালে ব্রাহ্মদের একটি দল ঢাকায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল।[৩১] পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্রের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল ব্রাহ্ম স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যা পরবর্তীকালে জগন্নাথ কলেজে [বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়] পরিবর্তিত হয়। তবে তিনি নারীদের জন্যও স্কুল খুলেছিলেন। বাংলা মাধ্যমের স্কুল প্রতিষ্ঠায় জোর দিয়েছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র।[৩২] পূর্ব বাংলার অন্য বিখ্যাত

ব্রাহ্মকর্মী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৪ সালে পোগোজ স্কুলে শিশুদের জন্য একটি কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় খুলেন যেখানে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের আমোদজনকভাবে শিক্ষাদান করা হতো। তিনি গেন্ডারিয়ায় তার বাড়িতে রবিবারীয় বিদ্যালয় (Sunday school) স্থাপন করে বালক-বালিকাদের উপদেশমূলক পাঠ ও সংগীত শিক্ষা দিতেন। ১২৮৮ সনে তিনি পশ্চিম পাড়া গ্রামে নিজের নতুন বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যার ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করতেন।[৩৩] পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে নারীশিক্ষা বিস্তারে যে কয়টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে ইডেন ফিমেল স্কুল, নারীশিক্ষা মন্দির, কামরুন্নেসা স্কুল, ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন (১৯১৮) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নারীশিক্ষা মন্দির বর্তমানে শেরে বাংলা মহাবিদ্যালয় নামে পরিচিত।[৩৪]

ইডেন মহিলা বিদ্যালয় ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম সরকারি বালিকা বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত এই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট আলোচনার দাবি রাখে। ঢাকার কোথায় ইডেন মহিলা স্কুলের প্রাথমিক পর্বের যাত্রা শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া যায় দীননাথ সেনের কন্যা সুশীলা দেবীর কবিতা, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী এবং বিহারীলাল সেনের বক্তব্য থেকে। সুশীলা দেবী তার কবিতায় ঢাকার সূত্রাপুরে ৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তী সময় এই স্কুল ইডেন স্কুল হিসেবে আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে লিখেছেন যে,

জনম হইতে মোরে যতন করিলে,
পরম আদরে কত জ্ঞান শিক্ষা দিলে।
ছিল না বালিকা স্কুল ঢাকার সহরে
পাঠশালা বসাইলে মম শিক্ষা তরে।
ছয়টি বালিকা মাত্র প্রথম সময়,
তথাপি উৎসাহে বসে কন্যা বিদ্যালয়।
থাকিতেন রাম বাবু ঢাকা সূত্রাপুর,
তথায় যেতাম স্কুলে আনন্দ প্রচুর।
তাঁরি গৃহবাসী ছিল মেয়ে তিনজন,
আমি আর অন্য দুটি, একুনে ছ'জন।
এই ক'টি ছাত্রী লয়ে স্কুলের পত্তন,
শিক্ষক বিহারী সেন অতীব সজ্জন।
কালে সেই পাঠশালা হইল উন্নত,
ইডেন ইস্কুল নামে এবে সে বিখ্যাত
শেষ নিবেদন এই তোমার চরণে,
ভকতি বিশ্বাস যেন লভি এ জীবনে।[৩৫]

আদিনাথ সেন তাঁর রচিত *স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে মত দেন যে সুশীলা দেবীর বর্ণিত এই বিদ্যালয়টি পরবর্তী সময়ে আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে ইডেন ফিমেল স্কুল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[৩৬]

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতে প্রাণ কুমার দাসসহ ঢাকার অন্যান্য কয়েকজন ব্রাহ্মর উদ্যোগে অভয়চন্দ্র দাসের বাসায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায়। স্কুলটি ফরাসগঞ্জে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ার কিছুকাল পরে এটি যুবতি বিদ্যালয় হিসেবে নারীদের শিক্ষা প্রদান শুরু করে। এই বিদ্যালয়টি আনন্দমোহন দাসের বালিকা বিদ্যালয় এর সাথে একত্রিত হয়ে ইডেন স্কুল হিসেবে পরিচিতি পায়। উল্লেখ্য, এই দুটি বক্তব্যেই বিহারীলাল সেনকে স্কুলের শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করা হয়। যদিও বিহারীলালের বক্তব্যে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অবদানকে তেমনভাবে উল্লেখ করা হয়নি। উল্লিখিত কয়েকটি মন্তব্য ও অন্যান্য তথ্য বিবেচনাপূর্বক ইডেন স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করা যায় এভাবে যে: স্থানীয়দেরকে মদ্যপান থেকে বিরত রাখা, নারীদেরকে শিক্ষা প্রদান, প্রত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকার ব্রাহ্মরা ১৮৭১ সালে ফিলানথ্রপিস্ট সোসাইটি ফর সোশ্যাল রিফর্ম বা শুভসাধিনী সভা (Society for doing Good) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। এই সভাটি যুবতি স্কুল বা বয়স্ক বালিকা বিদ্যালয় (Adult Female school) নামে পরিচিতি পেয়েছিল যা ‘সম্ভবত’ সময়ে সময়ে অভয়চন্দ্র দাস, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও সূত্রাপুরের রাম বাবুর বাসায় স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তা ইডেন স্কুল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৩৭] এই তিনটি বক্তব্য থেকে ব্রাহ্মরা ইডেন স্কুল প্রতিষ্ঠার সাথে শুরু থেকে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন সে বিষয়টি স্পষ্ট। স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষার্থীও ছিল ব্রাহ্ম।

১৮৬৬ সালে মেরি কারপেন্টার যখন নারীশিক্ষার উন্নয়নে কাজ করার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন তখন ঢাকা ফিমেল নরমাল স্কুলের (পরবর্তী সময়ে বন্ধ হয়) প্রধান শিক্ষক মহেশ চন্দ্র গাঙ্গুলি এক চিঠি মারফত তাকে তাদের নারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুলটি পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[৩৮] এ যাত্রায় মেরি কারপেন্টারের পক্ষে ঢাকায় আগমন সম্ভব না হলেও ১৮৭৬ সালে ভারত সফরের অংশ হিসেবে ঢাকায় এসে তিনি ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত বয়স্ক বালিকা স্কুলটি পরিদর্শন করেন। ভারতে নারীশিক্ষার উন্নয়নে তিনি সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন সেখানে এই বিদ্যালয় সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

> Dacca, the capital of East Bengal, though somewhat remote, is considerably in advance of other places in female education, through the efforts of many enlightened Native Gentlemen. Here I found a small adult school, unique in its character, which is chiefly attended by married ladies, whose husbands desire for them intellectual improvement. Some of them learn English.[৩৯]

মেরি কারপেন্টারের লেখার ওপর ভিত্তি করে বাংলা সরকার এরপরে শুভসাধিনী সভাকে আরেকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রদান করলে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজসুন্দর মিত্র পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিকে বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরের মত দেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্মীবাজারে (পরে অন্যত্র স্থানান্তরিত) আত্মপ্রকাশ ঘটে ইডেন মহিলা স্কুলের। বাংলার লেফটেন্যান্ট অ্যাশলে ইডেনের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।[৪০] বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সহযোগী সচিব হিসেবে ছিলেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। এই স্কুলটি সরকারি সাহায্য, ব্রাহ্মসুধীজনদের দান

ও অন্যান্য স্থানীয়দের অর্থ সহযোগিতায় সাফল্যের সাথে চলতে থাকে।[৪১] এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীদের জন্য গাড়ি ক্রয় ও এর ফলে অভিভাবকদের সম্ভাব্য স্বস্তি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে বলা হয় "সম্প্রতি রঘুবাবুর বদান্যতায় যানাভাব বিমোচিত হইলে, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী অভিভাবকদিগের আর আহ্লাদের সীমা থাকিবেনা বলা বাহুল্য।" নতুন ক্রয়কৃত ঘোড়ার গাড়িতে করে ২০ জন ছাত্রীর স্কুল যাতায়াত করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়।[৪২] *বামাবোধিনী* পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী ১৮৮০ সালে ঢাকার ইডেন মহিলা স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৫৩। ১৮৯৬ সালের শিক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৩০ জন যাদের মধ্যে ১ জন শিক্ষার্থী ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল। ১৯১১ সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৪৪ জন।[৪৩] ইডেন স্কুল ১৯২৬-২৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে এবং আরও পরে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদে এক সময় ব্রাহ্মদের প্রাধান্য থাকলেও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে, বিশেষত প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্রাহ্মসমাজের নাম সংযুক্ত না থাকায় কালক্রমে এটিতে ব্রাহ্মপ্রভাব লোপ পায়।[৪৪]

এছাড়া ছাত্রছাত্রীদেরকে নীতি, ধর্ম, সংগীত শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্রাহ্মরা ঢাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৯১ সালে চণ্ডীকিশোর কুমারী পূর্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শিশুদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যেখানে প্রতিদিন ২০ জন বালক-বালিকা শিক্ষাগ্রহণ করত।[৪৫] প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থেকে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়ে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারীদের পাশাপাশি ব্রাহ্ম নারীরাও সংযুক্ত হয়েছিলেন নিজেদের পারদর্শিতায়।[৪৬]

ময়মনসিংহে নারীশিক্ষার প্রসারে ব্রাহ্মসমাজ

প্রাথমিক পর্যায়ে ময়মনসিংহে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার ঘটেছে মূলত ছাত্রদের দ্বারা এবং চাকরিসূত্রে আগত প্রগতিশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায়। লোকাল কোর্টের মোক্তার বাবু কালী কুমার গাঙ্গুলি, ইংরেজি স্কুলের শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস এবং বাংলা স্কুলের শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র গুহের সাহায্যে ময়মনসিংহে ১৮৫৪ সালে সাপ্তাহিক ব্রাহ্ম প্রার্থনার আয়োজন করা শুরু হয়। কিন্তু এই সমাজ প্রায় ১০ বছর নির্দিষ্ট কোনো প্রার্থনা ঘর ছাড়া তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে। ১৮৬৫ সালে একটি ঘর ক্রয় করা হয় মন্দির স্থাপন ও সাপ্তাহিক প্রার্থনা আয়োজনের জন্য। এই বছরে ময়মনসিংহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন ময়মনসিংহের ব্রাহ্মকর্মীরা। একই বছরের ডিসেম্বরে কেশবচন্দ্র সেন ময়মনসিংহ জেলায় ভ্রমণে আসার পর থেকে ব্রাহ্মসমাজ তার কার্যক্রম ব্যাপক আকারে শুরু করে।[৪৭] ১৮৫০-এর দশকে ব্রাহ্ম ধর্মমতে দীক্ষা লাভকারী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৮৬৯ সালে ময়মনসিংহে ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপন করে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মমত প্রচারের ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৪৮] জেলা গেজেটিয়ারের তথ্য মতে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এসে ময়মনসিংহ মক্তব, মাদ্রাসা, টোল ছাড়া কোনো ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত শ্রেণির বসবাস ময়মনসিংহে তেমন ছিল না। উপরন্তু প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলোর অর্থনৈতিকভাবে বিত্তবান হওয়ার দিকে মনোযোগ ছিল বেশি।[৪৯] এই অবস্থায় ময়মনসিংহে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা বিস্তারে ব্রাহ্মদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টাকে আন্দোলিত করেছিল। ১৮৬৫ সালে বিশিষ্ট

ধর্মবেত্তা গিরিশচন্দ্র সেন নারীশিক্ষার উন্নয়নে ময়মনসিংহে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারকনাথ রায়ের কন্যা রাধাসুন্দরী ছাড়াও রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে কাদু ও বিন্দু ছিলেন এই স্কুলের প্রথমদিকের ছাত্রী। তবে কিছুকাল পরে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।[৫০] ১৮৭২ সালে ময়মনসিংহে 'হিতকরী' সভা নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় যারা নারীদেরকে জেনানা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে কাজ করেছে। এই সভার প্রধান ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সমর্থক বাবু ভগবান চন্দ্র সেন। তার গৃহীত উদ্যোগগুলো ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিল।[৫১] হিতকরী সভার সভাপতি ভগবান চন্দ্র সেনসহ সম্পাদক মধুসূদন সেন, সদস্য শ্রীনাথ চন্দ্র, শরচ্চন্দ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মরা একত্রে এই সভার মাধ্যমে অত্র জেলার নারীশিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছেন। প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর থেকে শ্রীনাথ চন্দ্র সংগঠনের প্রধান প্রধান দায়িত্বগুলো পালন করা শুরু করেন এবং ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত এর সম্পাদক ছিলেন। কলকাতা, ঢাকা ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভার ন্যায় এই সভা ময়মনসিংহের নারীদেরকে বাড়িতে অবস্থান করেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিল। সভার শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার কয়েকজন জমিদার পত্নীও অংশ নিয়েছিলেন। জেলা বোর্ডের পক্ষ থেকে ওই সময় সভা বার্ষিক ২৫০ টাকা করে সাহায্য পেয়েছিল। পরবর্তী সময় শ্রীনাথ চন্দ্র অন্যত্র চলে গেলে সভার কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। শ্রীনাথ চন্দ্রের কন্যা লাবণ্যলতা চন্দ্র পরে লাকসামে প্রতিষ্ঠিত ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৫২]

ময়মনসিংহের বিখ্যাত বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িয়ে রয়েছে ব্রাহ্মসমাজের নাম। ব্রাহ্মদের উদ্যোগে গোপীকৃষ্ণ সেনের বাসায় নতুন একটি বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় শরচ্চন্দ্র চৌধুরী যেখানে পাঠদান করতেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্কুলটি ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে থাকে। একসময় এর নামকরণ করা হয় আলেকজান্ডার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।[৫৩] এই সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নবকুমার সমাদ্দার।[৫৪] ১৯১২ সালে Minna G Cowan নিউ ইয়র্ক থেকে *The Education of the Women in India* শিরোনামে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন যেখানে একটি অধ্যায়ে 'Eastern Bengal and Assam' নামে নতুন প্রদেশ ধরে পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন (১ম বঙ্গভঙ্গের পরের সীমানা ও নাম বিবেচনায়)। এতে ময়মনসিংহের আলেকজান্ডার বিদ্যালয়ের সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়:

> The Middle Schools, partly English and partly only vernacular, are some twenty number, varying in type from a long established school such as the Alexandra Girls' School at Mymensingh, with ten teachers, and a Headmistress from the Isabella Thoburn College! to one which has only six scholars beyond the Primary stage and one mistress, but which must be raised in standard and type for the sake of the district. The generosity of the native landowners is to be noted in connection with these schools; in two cases a whole new building and site have been acquired in this way.[55]

ময়মনসিংহের আলেকজান্ডার বালিকা বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত বিকাশে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন মুক্তাগাছার জমিদার রাজা জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরী। রাজা জগৎ কিশোরের মা বিদ্যাময়ী দেবীর নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ করা হয় যা বর্তমানে বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচিত।[৫৬]

বরিশালে নারীশিক্ষার প্রসারে ব্রাহ্মসমাজ

বাংলার ব্রাহ্মবাদের ইতিহাসে বরিশাল অঞ্চল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯১২ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, "At present the Barisal Samaj is one of the strongest of the provincial Samajes in Bengal".[৫৭] ১৮৬০ সালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বিখ্যাত ব্রাহ্মকর্মী বাবু রামতনু লাহিড়ী বরিশালে এসেছিলেন জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। তার প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা বরিশালে ব্রাহ্মধর্মের ভিত প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল। তিনি বরিশালের ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম কর্মী রাখাল চন্দ্র রায়ের চিন্তার জগতে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[৫৮] ওই বছরের ২৩ জুন নন্দকুমার সেন, হরিশচন্দ্র মজুমদার, গোপীনাথ রায়, বৈদ্যনাথ রায় ও ললিত মোহন সেন বরিশালে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন। ১৮৬৫ সালে দুর্গামোহন দাস (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পিতৃ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সরকারি উকিল হিসেবে বরিশালে এসে ব্রাহ্মসমাজের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করতে শুরু করেন। এই ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশের পিতামহ সর্বানন্দ দাস।[৫৯] *ঢাকা প্রকাশ*-এর এক প্রতিবেদনে বরিশালের ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সার্বিক কার্যাবলি, বরিশালের ব্রাহ্ম ধর্মমতের চর্চা, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের কর্মসূচি ও ব্রাহ্মমত প্রচারের ব্যাপারে উল্লেখের পাশাপাশি ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠা ও নারী ব্রাহ্মিকাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে সুবিধা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।[৬০] পূর্ব বাংলার ব্রাহ্মদের অন্যতম পথপ্রদর্শক দুর্গামোহন দাস যে কয়টি বছর বরিশালে ছিলেন সেসময় নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে নিরলস কাজ করে গেছেন। তিনি তার বিধবা সৎমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন; পাশাপাশি নিজেও একজন বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন।[৬১] ঢাকা ও ময়মনসিংহের মতো বরিশালেও ব্রাহ্মদের উদ্যোগে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভার অধীনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অনেক বালিকা বিস্ময়কর ফলাফল লাভ করেছিল। নানারকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও অন্তঃপুরের নারীদের অপ্রত্যাশিত সাফল্য ও কিছু পরামর্শমূলক নির্দেশনা সম্পর্কে *অবলাবান্ধব* পত্রিকায় খবরও প্রকাশিত হয়েছিল।[৬২] কলকাতার যদুনাথ চক্রবর্তী ১৮৬৭ সাল নাগাদ ব্রাহ্মনেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মারফত বরিশালে এসে গিরিশচন্দ্র মজুমদারের সাথে মন্দিরে আচার্যের কার্যসম্পাদনের পাশাপাশি অন্তঃপুরে ব্রাহ্ম নারীদেরকে শিক্ষাপ্রদানে সহায়তা করেন। তারা ঐ সময় বয়স্ক নারীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে দুপুর বেলার একটি বিদ্যালয় চালু করেছিলেন যেখানে মি. বেলফুর নামের একজন ব্রিটিশ জজ এর স্ত্রী সেলাই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।[৬৩]

ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে নারীশিক্ষার উন্নয়নে ১৮৬৮ সালে বরিশালে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও নারীদের শিক্ষা গ্রহণের প্রতি স্থানীয়দের অনুরাগ সৃষ্টি না হওয়ার দরুন

স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। এসময় আচার্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্ম নারীদেরকে শিক্ষা দান করতে থাকেন। তার কাছে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে শিক্ষিত হন তার স্ত্রী মনোরমা মজুমদার, রাখাল চন্দ্র রায়ের স্ত্রী সৌদামিনী দেবী, দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রক্ষময়ী দেবী। মনোরমা মজুমদার পরবর্তী সময়ে ইডেন মহিলা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৬৪]

উনিশ শতকের সত্তর দশকের শুরুতে বরিশাল জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন জগৎবন্ধু লাহা এমএ। তিনি ও আরো কয়েকজন ব্রাহ্ম অনুসারীর উদ্যোগে ১৮৭১ সালে বরিশালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নারী কল্যাণ সভা'। এটির উদ্দেশ্য ছিল বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া ও পারিতোষিক বিতরণ। এইটি পরে 'বাখরগঞ্জ হিতসাধিনী সভা'য় পরিণত হয়। এর কিছুকাল পরে সর্বানন্দ দাস একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার মেয়ে কুমারী স্নেহলতা দাস এই স্কুলে দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। স্কুলটি একসময় সরকারি সাহায্য লাভ করে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।[৬৫] উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠা লাভের পরে একটি সময় এসে দেখা যায় যে এই বিদ্যালয়ের ভার সাধারণের হাতে চলে গেছে যেখানে ব্রাহ্মরা স্কুল কমিটির সভ্য হয়ে ছিলেন শুধু। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে অনেক নারী শিক্ষার্থী কৃতিত্ব লাভ করেছিল।[৬৬] ১৮৭৭ সালে বিহারীলাল রায় চৌধুরীর স্ত্রী শিবসুন্দরী দেবীর প্রচেষ্টায় বরিশালে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর আচার্য ছিলেন মনোরমা মজুমদার এবং সম্পাদিকা ছিলেন প্রসন্নকুমারী দাস। সভার কার্যপরিচালনার ভার শুরু থেকেই নারীরা পালন করে আসছিলেন। ১৯২৭ সালে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত *বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* গ্রন্থ রচনার সময় অল্পবয়স্ক ব্রাহ্ম বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য পূর্বপ্রচলিত নীতিবিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্য নিয়মিতভাবে পরিচালনার ভার বরিশালের কতিপয় নারীর হাতেই ন্যস্ত ছিল। এ সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের বর্ণিত হয়েছে;

> ১৮৮১ সালে স্বর্গীয় চণ্ডিচরণ সেন এখানে মুনসেফের কার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মবালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য একটী নীতিবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তিনি নিজেই অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার স্থানান্তরগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ হয়। কয়েক বৎসর পরে (১৮৯২-৯৩) ব্রাহ্মবন্ধুসভার উদ্যোগে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করা হয়। ইহার কার্য্য নিয়মিতভাবে চালনার ভার বর্ত্তমানে কতিপয় মহিলার উপর ন্যস্ত আছে; তন্মধ্যে শ্রীযুক্তা কুসুম কুমারী দাস, তত্ত্বাবধায়িকা; কুমারী শান্তিসুধা চ্যাটার্জী বি, এ, লীলাময়ী চক্রবর্তী, শান্তিলতা দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।[৬৭]

তবে বরিশালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্ম ব্যক্তিত্ব ছিলেন ১৮৮২ সালে ব্রাহ্মসমাজের সাথে যুক্ত হওয়া অশ্বিনী কুমার দত্ত; শিক্ষাবিস্তার ও স্বদেশি আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন তারিখে তাঁর পিতা ব্রজমোহন দত্ত বরিশালে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেন। ব্রজমোহন দত্ত প্রতিষ্ঠিত হাই স্কুলটিকে তার তিন পুত্র অশ্বিনী কুমার, কামিনী কুমার এবং যামীনি কুমার কলেজে রূপান্তর করেন এবং পরবর্তীকালে এতে এফ.এ (১৮৮৯) ও বি.এ (১৮৯৮) ক্লাস চালু করা হয়।[৬৮] উল্লেখ্য, পূর্বের ব্রজমোহন স্কুল এর সাথে কলেজ একত্রিতভাবে ব্রজমোহন ইনস্টিটিউট হিসেবে

পরিচিতি লাভ করেছিল এবং অশ্বিনীকুমার এখানকার ইংরেজি বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে পাঠদান করেছিলেন।[৬৯] বি.এম কলেজে নারীদের জন্য আই. এ, আই. এসসি, বি. এ ক্লাসে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ছিল যেহেতু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের পূর্ব পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত মেয়েদের কলেজ পূর্ববঙ্গে ছিল না বলে মেয়েরা উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলেদের কলেজে পড়ালেখার সুযোগ পেত। ব্রজমোহনের বংশেরই সাবিত্রী দেবী ছিলেন এই কলেজের প্রথম নারী শিক্ষার্থী। ক্লাসে তার বসার জায়গার সামনে কাঠের পার্টিশন ছিল এবং শিক্ষক নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি (নাম ডাকা) নেয়ার সময় তার চুড়ির শব্দে বুঝতে পারতেন।[৭০] ১৮৮৭ সালে অশ্বিনী কুমার দত্ত বরিশাল শহরে মেয়েদের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৭১]

অনেক ব্রাহ্ম নারীও পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছেন। বরিশালে জন্মগ্রহণ করা অবলা বসু সমসাময়িক সময়ে বাংলার প্রসিদ্ধ নারী সংস্কারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।[৭২] নারীশিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখা অবলা বসু ছিলেন দুর্গামোহন দাসের কন্যা। তিনি বেথুন কলেজ থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রাস পাশ করার পরে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন।[৭৩] তাঁর শিক্ষাভাবনার মূলে ছিল শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে একজন ভালো মাতা, উত্তম সহধর্মিণী এবং সর্বোপরি সমাজের নিকট প্রয়োজনীয় একজন ভালোমানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট নারী কবি বরিশালের ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী কামিনী রায় প্রথম বাঙালি নারী হিসেবে বি.এ. ডিগ্রি অর্জনের কৃতিত্ব লাভ করেন। তার কবিতার বইয়ের পাশাপাশি 'Some Thoughts on the Education of Our Women' (১৯১৮), 'বালিকা শিক্ষার আদর্শ: অতীত ও বর্তমান' (১৯১৮) শিরোনামে নিবন্ধ প্রকাশিত হয় নারীশিক্ষাকে বিষয়বস্তু হিসেবে রেখে।[৭৪] এছাড়া বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ সংশ্লিষ্ট কুসুমকমারী দাস (জীবননান্দ দাশের মাতা) কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

চট্টগ্রামে নারীশিক্ষার বিকাশে ব্রাহ্মসমাজ

চট্টগ্রামে ১৮৫৫ সালে এবং কুমিল্লায় ১৮৫৪ সাল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।[৭৫] চট্টগ্রামে নারীশিক্ষার বিস্তারে ব্রাহ্মধর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা চালু করেছিলেন 'সানডে স্কুল'। তবে চট্টগ্রামে ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম ব্যক্তি হিসেবে অবদান রেখেছিলেন ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীরের জামাতা যাত্রামোহন সেন (জে. এস. সেন)। তিনি ১৮৭৬ সালে ডাক্তার খাস্তগীরের নামে চট্টগ্রামে একটি ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত এই স্কুলটি বর্তমানে চট্টগ্রামের প্রাচীন ও অন্যতম বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে শিক্ষা প্রদান করে যাচ্ছে।[৭৬] ডা. খাস্তগীর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টিকে বর্তমানের পর্যায়ে নিয়ে আসার পেছনে যাত্রা মোহন সেনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯০৭ সালে স্কুলের জন্য ভূমি ও ভবন দান করে অন্নদাচরণ খাস্তগীরের নামে নামকরণ করেন। যে তিনজন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটির যাত্রা শুরু হয়েছিল তারা হলেন আন্না সেন, প্রেম কুসুম, ও জুনি। প্রতিষ্ঠার সময়ে সুশীলা সেনগুপ্তা ও নির্মলা শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।[৭৭] উল্লেখ্য যে, অন্নদাচরণ খাস্তগীরের কন্যা কুমুদিনী খাস্তগীর দাস চট্টগ্রামের প্রথম নারী শিক্ষার্থী

হিসেবে বিএ পাশ করেন এবং বেথুন কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের সহকারী পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ডা. খাস্তগীরের অন্য আরেকজন কন্যা লহিনী সেন কলকাতায় উচ্চশিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন এবং *পরিচারিকা* নামক মাসিক পত্র সম্পাদনা করেছিলেন।[৭৮]

এছাড়া বর্তমানের কুমিল্লাতে ব্রাহ্মদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[৭৯] কুমিল্লায় নারীসমাজের উন্নয়নে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী যে জনহিতকর পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতাকারী হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডের জন্য পরিচিতি পাওয়া ব্রাহ্মব্যক্তিত্ব কালিচরণ দে ছিলেন অন্যতম। ১৮৭৩ সালে কুমিল্লার নানুয়াদিঘীর তীর ও কান্দিরপাড়ে ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত কান্দিপাড়ে ফয়জুন্নেসার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রীরা অধিকাংশ ছিলেন ব্রাহ্ম অথবা হিন্দু।[৮০] ফয়জুন্নেসার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রাহ্মকর্মী কালীচরণ দে সহযোগিতা করেছিলেন বলে ব্রাহ্ম এবং হিন্দু পরিবারের বালিকারা উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণে আগ্রহী হয়েছিল। কান্দির পাড়ের বিদ্যালয়টি 'ফয়জুন্নেসা মধ্যম স্বদেশীয় বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিতি পায় এবং ১৮৮০-৮১ সালে (ইডেন স্কুল বাদে) এই স্কুলটিকে সরকারি শিক্ষা প্রতিবেদনে 'The best girls school' বলে অভিহিত করা হয়।[৮১]

পূর্ববঙ্গ নারীশিক্ষা প্রসঙ্গ ও ব্রাহ্ম সংবাদপত্র

কলকাতার বাহিরে ব্রাহ্ম ধর্মমতের প্রচার-প্রচারণা পুরো বাংলা জুড়ে হওয়ার পেছনে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।[৮২] পুরো বাংলায় নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে ব্রাহ্মদের প্রচারিত *বামাবোধিনী* পত্রিকার প্রতিবেদন নারীশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তার জগৎকে প্রভাবিত করেছিল। ১২৭২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস, ২১তম সংখ্যা থেকে *বামাবোধনী* পত্রিকার শিরোনামের নিচে লেখা হতো মহানির্বাণ তন্ত্রের শ্লোক- "কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" - কন্যাকে পালন করবে এবং যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিবে।[৮৩]

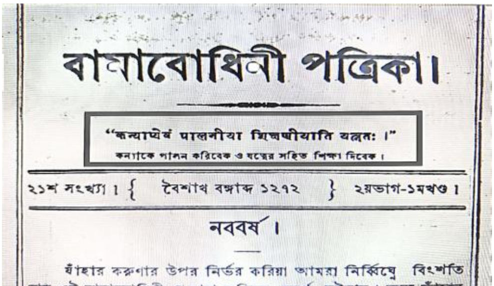
বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১শ সংখ্যা। { বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭২ } ২য়ভাগ-১মখণ্ড।

নববর্ষ।

যাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া আমরা নির্ব্বিঘ্নে বিংশতি মাস এই বামাবোধিনী প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। অদ্য তাঁহার

চিত্রঃ *বামাবোধিনী*, ২১শে সংখ্যা, বৈশাখ ১২৭২ বঙ্গাব্দ।

তত্ত্ববোধিনী ও *বামাবোধিনী* পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্মরা নারীশিক্ষার অনুকূলে এক নতুন ভাবনা প্রচার করেছিল। তারা সুখী দাম্পত্য জীবনের আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে স্ত্রীশিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়। পত্রিকায় প্রচার করা হয় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়া, চিন্তাভাবনা, জীবনদর্শনে পার্থক্য থাকলে আদর্শ দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতার পার্থক্য কোনোদিনই গোছানো সম্ভব নয় যদি না স্ত্রী কিছুটা শিক্ষিত হয়।[৮৪]

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মদের দ্বারা প্রকাশিত হতো *ঢাকা প্রকাশ*, *হিতকরী*, *সেবক*, *রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ*, *দি ব্রাহ্ম পাবলিক অপিনিয়ন*, *ঈস্ট*, *দি নিউ লাইট*, *বঙ্গবন্ধু*, *চারুবার্তা*, *বান্ধব* ইত্যাদি সংবাদপত্র। পূর্ববঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছে *ঢাকা প্রকাশ* (১৮৬০) পত্রিকা। এই পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো ঢাকায় প্রথম বাংলা ভাষার মুদ্রণ যন্ত্র 'বাংলা যন্ত্র' (১৮৫৯) থেকে যেটি প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িয়ে আছে ঢাকার কতিপয় ব্রাহ্মমতাবলম্বীর নাম।[৮৫] *ঢাকা প্রকাশ* ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্ম উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো নানাবিধ সংবাদের সাথে ব্রাহ্ম ধর্মমত, সমাজসংস্কারে ব্রাহ্মদের গৃহীত পদক্ষেপ, শিক্ষা ও নারীশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যসংযুক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৮৬৯ সালে নারী স্বাধীনতা, স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও শিক্ষার পক্ষাবলম্বন করে বিক্রমপুরের (অথবা ফরিদপুর) লোনসিংহ গ্রাম থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক *অবলাবান্ধব* এর সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক বলেন,

> স্ত্রীদিগকে দেববৎ পূজা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারিত হইল কেহ যেন এরূপ মনে করেন না। এতদ্দেশীয় অবলাদিগকে ভগিনীবৎ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বন্ধন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। আমরা গুনের যেরূপ গৌরবও প্রতিষ্ঠা করিব, দোষেরও সেইরূপ উল্লেখ করিয়া তন্নিরাকরন চেষ্টা পাইব।[৮৬]

বঙ্গদেশের স্ত্রী জাতিকে বিদ্রুপ, উপহাসের পাত্র না বানিয়ে তাদের দুঃখ, দুর্গতি, দুর্দশা দূর করতে পারলে জীবন সার্থক হয়ে উঠবে এমন অভিপ্রায় এবং সংসারে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা ও নারীশিক্ষা বিষয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে *অবলাবান্ধব* ঢাকার সুলভ যন্ত্র থেকে মুদ্রিত হতে থাকে। সম্পাদককে পত্রিকা প্রকাশের কাজে সহায়তা করতেন ঢাকাবাসী অভয়কুমার দাসের পুত্র প্রাণকুমার। *অবলাবান্ধব*-এর কার্যক্রম কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর আর্থিক সংকটের কারণে ১৮৭৪ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[৮৭] উল্লেখ্য যে, *অবলাবান্ধব* পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মিলনী সভা ১৮৮২ সালে শিক্ষা কমিশনের নিকট দেশের নারীশিক্ষার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের জন্য পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচন করেছিল বলে সংবাদ প্রকাশ করে *ব্রাহ্ম পাবলিক অপিনিয়ন* নামক ইংরেজি পত্রিকা।[৮৮]

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সভা যেগুলো নারীশিক্ষা ও নারী আধুনিকায়নে কাজ করেছে; সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি সভা পত্রিকা প্রকাশের কাজে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এগুলো

নারীশিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে ভূমিকা পালন করেছে। এইসব সভার মধ্যে শুভসাধিনী সভা অন্যতম। ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত শুভসাধিনী সভার মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হতো সাপ্তাহিক *শুভসাধিনী* পত্রিকা যার মূল্য ছিল এক পয়সা। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ; অন্য আরেকটি সূত্র বলছে এর সম্পাদক ছিলেন কালী নারায়ণ রায়। তবে এই পত্রিকাটি কতদিন টিকেছিল সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য পাওয়া যায়।[৮৯] ১৮৯১ সালে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" সভা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যার মুখপাত্র হিসেবে তার সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠার একবছর পরে থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক *মহাপাপ বাল্যবিবাহ* নামক পত্রিকা। আয়তনে রয়েল এক ফর্মা ও বার্ষিক তিন টাকা মূল্যের এই পত্রিকাটি টিকেছিল দুই বছর। এই পত্রিকাটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অন্যদেরকে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছিল।[৯০] এই পত্রিকাগুলো নারীর বহুবিধ সামাজিক সংস্কার এবং নারীশিক্ষা যে সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। সর্বোপরি পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং তরুণদের মানস জগতে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত প্রভাব বিস্তার করতে এ সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

অন্তঃবিতর্ক ও ভিন্নমত প্রসঙ্গ

ব্রাহ্ম মতাদর্শ এবং দর্শনে নারীমুক্তি তথা শিক্ষার অগ্রাধিকার থাকলেও নারীশিক্ষার প্রণালি এবং বিষয়বস্তু নিয়ে মতবিরোধ ছিল। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিভাজনও তৈরি হয়েছিল।[৯১] ব্রাহ্মদের অনেকেই মনে করতেন নারী-পুরুষের শিক্ষা হতে হবে স্বতন্ত্র। উদারনৈতিক ব্রাহ্মরাও যে স্ত্রীশিক্ষা শব্দটিকে সীমিত অর্থে গ্রহণ করেছিলেন তার নিদর্শন মেলে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার একটি নিবন্ধ থেকে। নারীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা সমন্ধে বলা হয় :

> গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের লালন-পালনাদি করিয়া রমণীগণের শিক্ষা কার্য্যের অনেকগুলি নৈসর্গিক দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক আছে। এজন্য দর্শন বিজ্ঞানাদির অনুশীলন স্ত্রীশিক্ষার অন্তনির্বেশিত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। গুরুতর শ্রম, দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও সাভিনিবেশ প্রবৃত্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। ... তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, নীতি, গৃহস্থকর্ত্তব্যতা ও শিল্পাদি বিষয়ে শিক্ষাদানেই সমধিক যত্নবান হওয়া উচিত।[৯২]

নারীদের মধ্যে সচেতনতা ও আধুনিকতা বিস্তারে ভূমিকা রাখা *বামাবোধিনী* পত্রিকাও মনে করত, "যতটুকু তাহাদের (মেয়েদের) জ্ঞানোন্নতির নিতান্ত আবশ্যক, সেইটুকু উপার্জন করিলেই হইল। অতি কঠিন ও কঠোর বিদ্যা সকল সাধনার্থে মস্তিষ্ক বিলোড়ন করা স্ত্রী প্রকৃতি বিরুদ্ধ।"[৯৩] অন্যতম ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন নারীশিক্ষার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠাসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করলেও নারীদেরকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করাকে আবশ্যক বলে মনে করতেন না। তিনি বরং স্ত্রী স্বাধীনতার প্রশ্নে অনেকটা রক্ষণশীল ধারণা পোষণ করতেন।[৯৪]

এসব বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাহ্মরা দীর্ঘদিন ধরে নারীশিক্ষা প্রসারে যত্নবান হলেও একটা স্তরের পরে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা নিয়ে তাদের মধ্যেও সংশয়

ছিল। তারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা না করলেও নারীর উচ্চশিক্ষাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করতে পারেনি।[৯৫] অনেক ব্রাহ্ম নারী নারীশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়ে সংশয়মুক্ত হতে পারেননি। অবলা বসুও নারী-পুরুষের ভিন্ন কর্মক্ষেত্রের যুক্তিতে বালক-বালিকার শিক্ষা পৃথক হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, নিম্ন বিদ্যালয় বা কলেজে বাংলার মেয়েরা যে শিক্ষালাভ করে, তা জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। এখানে মেয়েদের সংগীত ও কলা শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু রন্ধন, পরিজনের পরিচর্যা, অতিথি সেবা, গো-সেবা, উদ্যান রচনা, এবং দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য কাজ শেখার কোনো ব্যবস্থাই নেই। অথচ এগুলোই নারী জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। অবলা বসু আরও বলেন, "বাঙ্গালীর মেয়েদের এমন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে, যেন তাঁহারা সুযোগ্য ও সাহায্যকারিণী পত্নী ও জননী হইতে পারেন, যেন তাহারা সম্মানজনক উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের সমর্থা হন।"[৯৬] নারীশিক্ষা সম্পর্কে অবলা বসুর চিন্তা-ভাবনা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় কল্যাণী ও গৃহলক্ষ্মী রূপে নারীর নব্যপ্রতিষ্ঠিত ভাবমূর্তির বাইরে তিনি যেতে পারেননি। নারীর নারীত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পৃথক কর্ম পরিধির কারণে নারীশিক্ষার ধরন বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্রাহ্মরাও সম্ভবত একমত হয়েছিলেন। ফলে সর্বোপরি তাদের কাছে নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় একজন ভালো মা, উন্নত গৃহিণী এবং আলোকপ্রাপ্ত সঙ্গী তৈরি করা।

মূল্যায়ন

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষা বিস্তারে সবচেয়ে কার্যকরী এবং বিস্তৃত পদক্ষেপগুলো গৃহীত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক। ব্রাহ্মধর্মের আচরণ এবং পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শের মধ্যে নরনারীর সমান অধিকার এবং নারীশিক্ষার বিষয়াদি স্বীকৃত ছিল।[৯৭] অপরদিকে হিন্দুসমাজ তখন নারীশিক্ষা নিয়ে বিভিন্নমুখী মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল এবং মুসলিম সমাজে তখন সবেমাত্র নারীশিক্ষার যাত্রা শুরু হয়েছে। শিক্ষা নারীর কোমল দেহ ও মনের উপর অশুভ প্রভাব ফেলবে, বহু পুরুষাসক্ত হয়ে পড়বে, দ্রুত বৈধব্য যোগ হবে– এরূপ ভাবনাও সমাজে বিদ্যমান ছিল। শুধু তাই নয় আধুনিক শিক্ষার একটা ভয়াবহ কুফল হচ্ছে 'প্রসব বিভ্রাট', এমন অদ্ভুত কথাও সমকালে প্রচলিত ছিল।[৯৮] এসময় মুসলিম লেখকগণও স্ত্রীশিক্ষার সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে তাদের অন্ধ কুসংস্কার ও বাল্যবিবাহকে দায়ী করেছেন। ব্রাহ্মরা শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা বাল্যবিবাহ প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। ১৮৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি মেয়েদের বিয়ের বয়স সর্বনিম্ন ১৪ রেখে 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ এ্যাক্ট' (Act III of 1872) পাশ হয়। যদিও এই আইন শুধু ব্রাহ্ম মতাবলম্বীদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল তবুও এর মাধ্যমে সমাজে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। অবরোধ প্রথা নিরসনেও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল ব্রাহ্মসমাজ।

মানবমুক্তি এবং ভালো মানুষের সৃষ্টি– এ আদর্শ সামনে রেখেই ব্রাহ্মরা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল। 'শিক্ষিত হলে ব্যক্তি কুসংস্কারমুক্ত হবে'– এ ধারণাও তারা পোষণ করতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা আবার গুরুত্বারোপ করেছিল নারীশিক্ষার প্রতি। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বাস্তব অবস্থা মেনে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে এগিয়েছেন তারা; পরবর্তী

সময় স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপনের প্রচেষ্টা নিয়েছেন।[৯৯] পূর্ববঙ্গে প্রথমে স্বাভাবিকভাবে ঢাকায়, তারপর ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মরা নারীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অজ পাড়াগাঁয়েও তারা মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করেছেন, যা ছিল সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে দুঃসাহসিক উদ্যোগ।

উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে এবং বিশ শতকের সূচনাকালে নারীশিক্ষা ছিল সংস্কারকদের জন্য ব্যাপক যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে অগ্রবর্তী ভূমিকায় ছিলেন ব্রাহ্মরা। বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় সংস্কারের ব্যাপক ভিত্তির জন্য ঐতিহ্য এবং ধর্মের আহ্বানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ব্যাপক ভিত্তি গড়ার জন্য এই অবস্থান পরিশেষে সংস্কারকে দুর্বলও করে তোলে। অনেকের মতে উনিশ শতকের সংস্কারবাদীরা তাদের সংস্কারের সমর্থন ধর্মের মধ্যে খুঁজতে গিয়ে অসচেতনভাবে একটি পশ্চাৎ-মুখী প্রক্রিয়ায় তাদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। নারীশিক্ষার উন্নয়নে ব্রাহ্মদের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর পরেও পূর্ব বাংলায় 'উচ্চশিক্ষা' প্রাপ্ত নারীর সংখ্যা কম হওয়ার অন্যতম কারণ হলো প্রবন্ধে আলোচ্য সময়ে এই অঞ্চলে নারীশিক্ষা কেবল স্কুল পর্যায় পর্যন্তই রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ মেয়েদের জন্য কোনো কলেজ পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পূর্ব বাংলায় জন্মগ্রহণ করে অনেকে কলকাতায় গ্রহণ করেছেন উচ্চশিক্ষার পাঠ।[১০০] তাই শাস্ত্রের ভিত্তিতে ব্রাহ্মদের ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার প্রচেষ্টা অনেকাংশেই সফল হয়নি। তবে, পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার মিশেলে, নানা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নারীর যে রূপকল্প তৈরি হয়, তার সার্থক রূপায়ণে সচেষ্ট ছিল ব্রাহ্মসমাজ, পূর্ববঙ্গেও যার প্রকাশ লক্ষণীয়। তবে ব্রাহ্মসমাজের হাত ধরে পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষার যে প্রাথমিক বিস্তার ঘটেছিল তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্ম এবং ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দু নারীদেরকেই বেশি প্রভাবিত করে। রক্ষণশীল হিন্দুরা ব্রাহ্মদের নারীশিক্ষার পদ্ধতি ও উদ্যোগ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পালটা পদক্ষেপ হিসেবে নারীশিক্ষার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তবে খুব দ্রুতই মুসলমান সম্প্রদায় ব্রাহ্মসমাজের এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে এবং আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারীর বন্ধন মুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাকে আমন্ত্রণ জানায়। ১৮৮৩ সালে স্থাপিত হওয়া 'ঢাকা মুসলমান সুহৃৎ সম্মিলনী' সভা নারীশিক্ষার প্রসারে যে কাঠামোতে কার্যক্রম শুরু করেছিল তা পূর্ববর্তী সময়ে ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভার শিক্ষা কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১০১] বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বাংলায় উদারনৈতিক মুসলিম সংস্কারকগণ নিজেদের সম্প্রদায়ের আধুনিকায়নের বাধা হিসেবে নারীদের অশিক্ষাকে দায়ী করে যেসকল সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোর পশ্চাতে সামাজিক সংস্কারের মডেল হিসেবে ব্রাহ্মসমাজ ভূমিকা পালন করেছিল। মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গে নারীদের জন্য আদর্শ হিসেবেও কাজ করেছে ব্রাহ্ম নারীরা।

প্রাথমিকভাবে ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষার পথে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে তা নিবারণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল। শুরুতে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষাকে অধিকতর বিস্তৃত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে তাদের প্রকাশিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে। এইভাবে তারা নারীশিক্ষা বিষয়ে জনমত গঠনে সাহায্য করেছে। তাছাড়া

পূর্ববঙ্গের রক্ষণশীল সমাজে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নারীশিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনীয়তাবোধ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে ব্রাহ্মসমাজ। সর্বোপরি নারীশিক্ষা সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও, পূর্ব বাংলার রক্ষণশীল পরিবেশে নারীশিক্ষার সূচনালগ্নে তারা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। সার্বিকভাবে পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষা বিস্তারে ব্রাহ্মসমাজ যে বহুমুখী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল, সে সত্য অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

তথ্যসূত্র

১ বিস্তারিতঃ Partha Chatterjee, 'The Nationalist Resolution of the Women's Question', Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (ed.), *Recasting Women: Essays in Indian Colonial History*, (New Brunswick: Rutgers University Press), 1990.

২ সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২), ৭৩।

৩ *প্রাগুক্ত*, ৭১।

৪ গৌতম নিয়োগী, 'ব্রাহ্ম আন্দোলনঃ সমাজ-সংস্কার ও মানব সেবা', *ব্রাহ্মধর্মের উৎস থেকে মোহনায়*, (কলকাতা: ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ, ২০০৩); মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৭), ২৫৬।

৫ প্রীতি কুমার মিত্র, "হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খণ্ড*, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), ২৮৯-২৯০।

৬ *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ; উদ্ধৃতঃ আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, (ঢাকা: প্রতীক, ২০২৩), ১৫৪।

৭ প্রীতি কুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, ২৮৯-২৯০।

৮ সোনিয়া নিশাত আমিন, *প্রাগুক্ত*, ৪৪।

৯ গোলাম মুরশীদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, (কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০১), ৫০।

১০ মাহফুজা হিলালী, "ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় আধুনিকতার অগ্রপথিক", অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান স্মারক বক্তৃতা ২০২৫, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৭ জুলাই ২০২৫), ২-৩।

১১ আরিফা সুলতানা, 'উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৫-২৬, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ২০০১), ১৫৭-১৫৮।

১২ শরীফ উদ্দীন আহমেদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, (ঢাকা: একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ২০১০), ৮১।

১৩ সুখময় সেনগুপ্ত, *বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা: বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা (১৮৩৫-১৯০৬)*, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫), ১২২।

১৪ শ্রীবঙ্কুবিহারী কর, *পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ব্রাহ্ম সমাজ, ২০১৪), ১২-১৩।

১৫ আবদুল হাই ঢালী, "ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় ব্রাহ্মসমাজ (১৮৩৩-৭২): ইতিহাসের আলোকে", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, *পঞ্চম খণ্ড*, ডিসেম্বর ১৯৮৭ (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ), ৬৩।

১৬ মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৭), ৬১১-৬১৩।

১৭ Sivnath Sastri, *History of the Brahmo Samaj, vol II,* (Calcutta: R. Chatterjee, 1912), 309.

১৮ তাসলিমা ইসলাম ও মোঃ মিন্টু আলী বিশ্বাস, 'ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ: অতীত ও বর্তমান', *ইতিহাস প্রবন্ধমালা*, (ঢাকা: ইতিহাস একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩), ৮৬।

১৯ মাহমুদা বেগম ও বিলকিস রহমান, 'পরিবার: সনাতন থেকে আধুনিক', সোনিয়া নিশাত আমিন, (সম্পা.), *ঢাকা নগরজীবনে নারী*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়েটিক সোসাইটি, ২০১০), ৬৪।

২০ মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২), ৩৭।

২১ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৫৯।

২২ *প্রাগুক্ত*, ১৬৬-১৬৬।

২৩ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ জানুয়ারি ১৮৭১।

২৪ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৬৭।

২৫ শ্রীবঙ্কুবিহারী কর, *প্রাগুক্ত*, ৮১।

২৬ *প্রাগুক্ত*, ১০৬; মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৩৭।

২৭ সাদেকা হালিম ও ফারজানা মান্নান বর্ণা, 'সভাসমিতি ও এনজিও', সোনিয়া নিশাত আমিন, (সম্পা.), *ঢাকা নগরজীবনে নারী*, (ঢাকা: এশিয়েটিক সোসাইটি, ২০১০), ৩৩২।

২৮ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ২২০।

২৯ *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ জুলাই ১৮৭২।

৩০ *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭১।

৩১ শরীফ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, ৮০।

৩২ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৬০।

৩৩ *প্রাগুক্ত*, ১৬৮।

৩৪ রেভরেন্ড প্রাণেশ সমাদ্দার, *ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম: বাংলাদেশ*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ব্রাহ্মসমাজ), ৩৫।

৩৫ আদিনাথ সেন, *স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, *১ম খণ্ড*, (কলকাতা: বালীগঞ্জ প্রেস, ১৯৪৮), সূচনাংশ।

৩৬ *প্রাগুক্ত*, ১৮৮।

৩৭ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৬২-১৬৪।

৩৮ Marry Carpenter, *Six Months in India, vol II,* (London: Longmans, Green and Co, 1868), 150-151.

৩৯ Sharif Uddin Ahmed, *Dacca: A Study in Urban History and Development*, (London: Curzon Press ltd., 1986), 72.

৪০ আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, ৬০।

৪১ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৬৪-১৬৫।

৪২ *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ জানুয়ারি ১৮৮৩।

৪৩ সোনিয়া নিশাত আমিন, *প্রাগুক্ত*, ১২২।

৪৪ ড. সানিয়া সিতারা, "ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজগৃহ", *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, অষ্টম সংখ্যা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ২০১৮), ২৪৬-২৪৭।

৪৫ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৬৯।

৪৬ মহসিনা আক্তার খানম, 'পরিবেশনা শিল্পে নারী: সঙ্গীত', সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ২৫৩।

৪৭ Sivnath Sastri, *Op. cit,* 344-346.

৪৮ আবদুল হাই ঢালী, *প্রাগুক্ত*, ৬৭।

৪৯ *প্রথম আলো*, ৭ নভেম্বর ২০১৯, ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কিশোর সংখ্যা, 'শিক্ষা: বাংলাদেশ'।

৫০ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৭১।

৫১ Sivnath Sastri, *Op. cit,* 354.

৫২ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৭০, ৫৯৪।

৫৩ *প্রাগুক্ত*, ১৭১।

৫৪ *প্রথম আলো*, ৭ নভেম্বর ২০১৯।

৫৫ Minna G Cowan, *The Education of the Women in India,* (New York: Fleming H. Revell Company, 1912), 89.

৫৬ *প্রথম আলো*, ৭ নভেম্বর ২০১৯, কলাম ২।

৫৭ Sivnath Sastri, *Op. cit,* 376.

৫৮ *Ibid,* 358-359.

৫৯ আপেল মাহমুদ, (সম্পা.), *জীবনানন্দ ও তাঁর পরিজন*, (ঢাকা: উয়ারী বটেশ্বর প্রকাশনী, ২০২৪), ৫১-৫২।

৬০ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ জুন ১৮৬৬।

৬১ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১০২।

৬২ *প্রাগুক্ত*, ১৭০।

৬৩ আপেল মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, ৪৭।

৬৪ শ্রীমম্মথমোহন দাস (সম্পাদক), *বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, (কলকাতায় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক মুদ্রিত, ১৯২৭), ১৪-১৫, ২৫ [পুনর্মুদ্রণ দেখুন: আপেল মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*]

৬৫ আপেল মাহমুদ, (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ৫২।

৬৬ শ্রীমম্মথমোহন দাস (সম্পাদক), *প্রাগুক্ত*, ১৫।

৬৭ *প্রাগুক্ত*, ৩৬।

৬৮ মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১), ৪৫।

৬৯ সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, 'অশ্বিনীকুমার দত্তঃ অবিভক্ত বাংলার বরিশালের রাজনীতির প্রাণপুরুষ', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি), ৯৫।

৭০ মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, ৪৫।

৭১ বি. আর. খান, 'দত্ত, অশ্বিনীকুমার', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১)।

৭২ রুমা ঘোষ, "বাঙালি নারীর উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ভূমিকা", ধনঞ্জয় ঘোষাল (সম্পা.), *নবচেতনায় বঙ্গনারী: প্রাক স্বাধীনতা পর্ব*, (কলকাতা: আশাদীপ, ২০১৫), ৬৩।

৭৩ বিস্তারিতঃ Nandini Jara, "Towards Writing a History of Women in the Brahmo Samaj (1872-1921)", unpublished PhD Thesis, (Kolkata: Jadavpur University, 2018), 230-241.

৭৪ বিস্তারিতঃ *Ibid*, 218-229.

৭৫ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ৬২, ৬৫।

৭৬ *প্রাগুক্ত, ১০২-১০৩;* আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, ৬১।

৭৭ রাফিয়া মাহমুদ প্রাত, 'প্রীতিলতা, নভেরাদের স্মৃতিধন্য ঐতিহাসিক ডা. খাস্তগীর স্কুল : নারী শিক্ষার এক আলোকবর্তিকা', *The Business Standard* (বাংলা), ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

৭৮ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ৫৭৩, ৫৯০।

৭৯ *প্রাগুক্ত*, ১৭২।

৮০ সোনিয়া নিশাত আমিন, *প্রাগুক্ত*, ১১৫।

৮১ মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), ৫৯৫, ৫৩৪।

৮২ Sivnath Sastri, *Op. cit*, 310.

৮৩ সোনালী রায়, 'ব্রাহ্ম সমাজ ও বাঙালি মেয়ে', ধনঞ্জয় ঘোষাল (সম্পা.), *নবচেতনায় বঙ্গনারী: প্রাক স্বাধীনতা পর্ব*, ৪৭।

৮৪ সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮), ৪৭।

৮৫ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৩২- ১৪৭; ৩২৩-৩২৫।

৮৬ *প্রাগুক্ত*, ১৪৫।

৮৭ *প্রাগুক্ত*, ১৪৫-৪৬।

৮৮ *Brahmo Public Opinion*, 20 April 1882, উদ্ধৃতঃ *প্রাগুক্ত*, ৫৬৩।

৮৯ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৪৪।

৯০ *প্রাগুক্ত*, ১৪৪-১৪৫।

৯১ David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*, (Princeton: Princeton University Press, 1979), 35.

৯২ *তত্ত্ববোধিনী*, ফাল্গুন ১৭৮৩ শকাব্দ।

৯৩ *বামাবোধিনী*, আষাঢ় ১২৮০ বঙ্গাব্দ।

৯৪ আদিনাথ সেন, *প্রাগুক্ত*, ১৭০।

৯৫ আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, ১৫৯।

৯৬ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ ভাদ্র, ১৩৪১।

৯৭ রেভরেন্ড প্রাণেশ সমাদ্দার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ২৭।

৯৮ আরিফা সুলতানা, *ঔপনিবেশিক বাংলার নারী*, ১৬৩।

৯৯ মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, ১৫৯।

১০০ আরিফা সুলতানা, 'উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৫-২৬, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ২০০১), ১৬০।

১০১ মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সভা-সমিতি*, (ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৪), ৪০-৪১।